ধারাবাহিক

আছে পান্থধাম

লোকোত্তর পুরুষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

মিতা মজুমদার

মনে পড়ে ১৯৯০ সালের ১৭ মে-র স্মৃতি। ভোরবেলা রবীন্দ্রসরোবরে হেঁটে বাড়ি ফিরছি। সঙ্গে মা আছেন। মহারাজও হাঁটতে বেরিয়েছেন। শান্ত, শ্যামল প্রকৃতির বুকে মহারাজের দিব্য উপস্থিতি—সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য! ওঁকে দেখে বিবেকচূড়ামণির শ্লোকটি মনে পড়ে গেল—''শান্তা মহান্তো নিবসতি সন্তো বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।'' হাঁটতে বেরিয়েও বসন্ত বাতাসের মতো নিঃশব্দে লোককল্যাণ করে যাচ্ছেন হাসি ও দৃষ্টি দিয়ে। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দুজনে প্রণাম করলাম। মহারাজও খুব খুশি।

তারপর লক্ষ করলাম মহারাজ আস্তে আস্তে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছেন। গুরুগম্ভীর। বললেন, ''দেখো, ভক্ত মনে করে ঈশ্বর আমারই জন্য এই পৃথিবী গড়েছেন। চন্দ্র, সূর্য, গাছপালা সব। এই পরিবারে জন্ম, এমন বাবা-মা, শিক্ষা-দীক্ষা সব এই আমারই জন্য, আমার মুক্তির জন্যই দিয়েছেন। দুষ্ট লোক দেখলেও ভক্ত ভাবে ঈশ্বর আমাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্যই এই লোকটিকে সৃষ্টি করেছেন। এই হল ভক্তের ভাব। সবসময় এইরকম ভাববে। এইভাবে জীবনের সবকিছু দেখবে, বুঝেছ?'' কথা কটি বলে করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।

একবার এক মহিলা ভক্ত তাঁর জন্মদিনে মহারাজকে প্রণাম করতে গেলে মহারাজ বললেন, ''বহুদিন আগে একটা দরকারি কাজে একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। বাংলোর গেট খুলে মোরাম বিছানো পথ দিয়ে বারান্দার কাছে গিয়ে একজন কর্মচারীকে দেখে কয়েকবার ডাকলাম। তা সে শুনতেই পায় না। সে তার হাতে-ধরা আয়নায় বিভোর হয়ে নিজেকে দেখছে আর পরিপাটি করে চুল আঁচড়াচ্ছে। এমনি করে নিজেকে সাজাও। শ্রীশ্রীমাকে আয়না করো। নিজেকে দয়া দিয়ে সাজাও। পবিত্রতা দিয়ে সাজাও। সত্যনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থতা, বিনয়, সমদর্শিতা, ভালবাসা দিয়ে সাজাও। আর মাঝে মাঝে মাকে সামনে রেখে দেখে নেবে সাজানো নিখুঁত হল কী না।''

আর একবার ওই উপলক্ষ্যেই বড় সুন্দর করে বলেছিলেন, ''আমাদের রোজই জন্মদিন। রোজ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখিকা

সকালে ঘুম থেকে আমরা নতুন মানুষ হয়ে জন্মাই। এক ধাপ-এক ধাপ করে এগিয়ে যাই।" মহারাজ বলতেন, ''ধর্মজীবনে চলে একটা কথা বুঝেছি, এই পথে চলাটাই একটা মস্ত আনন্দ, বিরাট পুরস্কার। আর জানো, end টাকেই means করে নাও।"

দুরকম বিকাশের কথা বলতেন মহারাজ। Horizontal growth (জাগতিক উন্নতি) আর Vertical growth (পারমার্থিক উন্নতি)। বলতেন, ''Horizontal growth অবশ্যই কাম্য। আমরা ভাল খাব, ভাল পরব, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাহায্যে দারিদ্র্যকে জয় করব, জীবনের মান উন্নত করব—নিশ্চয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা vertical growth অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে-দেবত্বশক্তি সুপ্ত আছে, তার বিকাশ ঘটানো। অন্তঃপ্রকৃতিকে জয় করে মানুষ প্রকৃত 'মান হুঁশ' হবে, দেবতা হবে, দেবতার চেয়েও বড় হবে। তার মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। ইতর প্রাণী বিচার করতে পারে না, তারা রিপু দমন করতে পারে না। মানুষ পারে। বিচার করে, অভ্যাস করে সে এসব আয়ত্ত করতে পারে, এগিয়ে যেতে পারে।"

মানবসম্পদ কথাটি মহারাজ খুব বলতেন। বলতেন, ''এই মানবসম্পদ যত বাড়বে, ততই দেশ উন্নত হবে, জগৎ সমৃদ্ধ হবে।" মানবসম্পদ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন মহারাজ। তার ফলশ্রুতি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান; এবং তাঁর সান্নিধ্যে এসে জীবনের অর্থ খুঁজে-পাওয়া, আমূল রূপান্তরিত হওয়া সমাজের সর্বস্তরের অগণিত মানুষ।

মানুষের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে বলে মহারাজ যে শুধু মানুষকেই ভালবাসতেন তা নয়। জীবজন্তুর প্রতিও তাঁর ছিল আশ্চর্য ভালবাসা! অনেকেই পশুপাখি ভালবাসেন, কিন্তু মহারাজের মতো কজন যে তাদের এত সম্মান করেন তা জানি না। মহারাজের মুখে 'তুই' সম্বোধনটি শোনা যেত না বললেই হয়। জীবজন্তুদের তিনি কখনও তুই বলতেন না। সাধারণত কুকুর ও বেড়ালদের আমরা অনেকসময় দূর থেকে ছুঁড়ে খাবার দিই। মহারাজ এটি অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। কাউকে ওরকম করতে দেখলে বলতেন, ''তোমরা কি আমাদের এভাবে খেতে দাও? আমাদের যেভাবে যত্ন করে একটা পাত্রে সাজিয়ে খেতে দাও, গ্লাসে জল দাও, ওদেরও সেই ভাবেই দেবে।"

প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনেছি, নরেন্দ্রপুরে কুকুর বেড়ালেরা তাদের নির্দিষ্ট পাত্রে খাচ্ছে। মহারাজ হয়তো কোনওদিন একটু সময় পেয়ে সেখানে এসেছেন আর হাতদুটি জোড় করে আস্তে আস্তে তাদের উদ্দেশে পরম শ্রদ্ধায় বলছেন, ''খাও, খাও।" মহারাজের জীবনে ব্যাবহারিক আর পারমার্থিকের ভেদ মুছে গিয়েছিল। তাঁর প্রতিটি কাজই ইষ্টের পূজা হয়ে গিয়েছিল।

মঠে যোগ দেওয়ার বেশ কিছুদিন পর কোনও কাজে একবার পূর্বাশ্রমের কাছাকাছি যেতে হয়েছিল মহারাজকে। সেইসময় কিছুক্ষণের জন্য জননীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন তিনি। খবর পেয়ে প্রতিবেশী, আত্মীয়রা সবাই দলে দলে দেখা করতে আসছেন। ভিড় একটু ফাঁকা হতেই একটি খাঁচায় দুটি পায়রা চোখে পড়ল তাঁর। ছোট ভাই কৃষ্ণপদকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন সেদিন হাটবার নয়, তাই তাঁকে মাংস খাওয়ানোর জন্যই পায়রা দুটিকে কিনে আনা হয়েছে। মহারাজ আর সহ্য করতে পারলেন না। খাঁচাটি বাইরে এনে পরম ভালবেসে পায়রা দুটিকে বুকে নিয়ে আদর করে আকাশে উড়িয়ে দিলেন। তারা যখন মহানন্দে উড়তে উড়তে দূর থেকে আরও দূরে ছোট্ট তারার মতো আকাশে মিলিয়ে গেল, তখন মহারাজ ভাইকে বললেন, ''মুক্তির আনন্দে ওড়ার এই দৃশ্যটা কত সুন্দর বলো দেখি!"

মহারাজ অনেকবার আমাদের বলেছেন,

''জানো, নরেন্দ্রপুরে একটা চন্দ্রবোড়া সাপ আমার ঘরে পোকা খেতে আসত। আষাঢ় মাসের বিকেল। ইলেকট্রিসিটি আসেনি তখনও। একদিন টেবিল ল্যাম্পের আলোয় চেয়ারে বসে কাজ করছি। কিছুক্ষণ ধরে পায়ের কাছে একটা টক টক শব্দ শুনছি। ভাবছি কিসের শব্দ! তখন তো চারদিকে জঙ্গল। আলো দেখে পোকারা এসে আলোয় ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কিছু টেবিলে পড়ছে, কিছু নিচে পড়ছে। তাকিয়ে দেখি একটা সাপ সেই পোকা খাচ্ছে। পায়ের কাছেই ঘরের জল যাওয়ার নালির মুখ। আমি তাকাতেই সাপটা চমকে উঠে কলকল করে সেই গর্ত দিয়ে পালাল। পরের দিন আবার ঠিক ওই সময় দেখি সাপটি এসে পোকা খেতে শুরু করেছে। ঠিক আমার পায়ের কাছেই তার মুখ। তা আমি নিচে তাকাতেই সেও আমার দিকে (ঘাড় কাত করে অবিকল সাপটির তাকানোর ভঙ্গি দেখিয়ে) চেয়ে দেখছে। আমি তাকে মৃদুস্বরে বললাম, 'খাও খাও।' বলে আবার কাজ করতে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পরেই টক টক শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম ও খাচ্ছে।'' তারপর পরম আহ্লাদের সুরে বললেন, ''জানো তো, ও রোজ আসত। কিন্তু কাউকে বলিনি। জানলে ওরা মেরে ফেলত।''

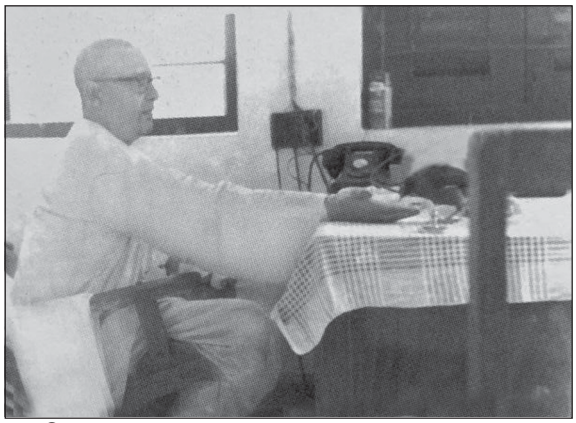

'শালিক আমার হাত থেকে খেত' (নরেন্দ্রপুর, ১৯৬৫)

মহারাজ বলতেন, ''নরেন্দ্রপুরে আবার শালিক, কাক—তারাও সব আসত। আমার কাঁধে বসে তাদের ভাষায় কথা বলত, হাত থেকে খেত। আমাকে একদম ভয় পেত না। একজন বিদেশিনী সেকথা শুনে বললেন, 'অসম্ভব! বিশ্বাস করতে পারছি না।' তা তাঁকে একদিন পাখিদের ওইসব কাণ্ড দেখানো হল। উনি আবার সেই দৃশ্যের ছবিও তুলে রেখেছিলেন।'' নরেন্দ্রপুরে এবং অন্যত্র জলি, মলি, কষ্টি, তুলি, ভোলানাথ, সিলকি, স্যাফায়ার, বুড়ো, বিশাখা, পুষি, সরমা, ভরত, সর্বমঙ্গলা এইসব কুকুর বেড়াল, হরিণ ও ছাগলদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় স্নেহ ও সখ্য ছিল। 'ভিক্ষু বুদ্ধদেবে'র লেখা 'বুড়োর শুধু খাই খাই' বইটিতে এদের সব কাহিনি লেখা আছে।

বহু কুকুরের সঙ্গে নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ক ছিল মহারাজের, আর সেজন্য কত দুঃখও সইতে হয়েছে তাঁকে। মহারাজ জলি ও স্যাফায়ারের কথা খুব বলতেন। বলতেন, ''আমার কপাল! যেখানেই যাই সেখানেই ওরা কেমন করে যেন জুটে যায়, আমাকে ভালবেসে ফেলে।'' দেওঘর বিদ্যাপীঠের 'জলি'র কথা মহারাজের মুখে কত যে শুনেছি! ত্রিপুরার রাজপরিবারের একটি ছেলে বিদ্যাপীঠে পড়ত। সে একবার বাড়ি থেকে চিঠি লিখল, ''মহারাজ, আপনার জন্য একটি বাচ্চা ককার স্প্যানিয়াল কুকুর নিয়ে যাব।'' মহারাজ নিষেধ করে তাকে চিঠি দিলেন—''এনো না; জীবজন্তু পুষলে বড় কষ্ট পেতে হয়।'' কিন্তু সে চিঠি পায়নি, যথাসময়ে তাকে নিয়ে হাজির। গোল্ডেন ককার স্প্যানিয়াল, সে-ই 'জলি'। মহারাজ বলতেন, ''অসম্ভব বুদ্ধি ছিল ওর, আর ভারি দুষ্টু। ওর জন্য কত কথা যে শুনেছি!

''তখন মেঝেতে বসে ক্লাস নিতাম। ছাত্ররাও মেঝেতে বসত। তা আমার জন্য আসন পাতা থাকত। কতদিন এমন হয়েছে,

জলি ছুটে গিয়ে আমার আসনে বসে পড়েছে। ছাত্ররা পরে দুষ্টুমি করে দুটো আসন পাততত, আমি পড়াতাম আর জলি আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত। ক্লাসের কোনও ব্যাঘাত করত না। তবে ছাত্ররাও ওকে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ করত। অভিযোগ উঠল ছাত্রদের পড়ার ক্ষতি হচ্ছে আমার জন্য। স্বাভাবিক। একদিন ইঁদারার দিকে মুখ ধুতে যাচ্ছি। জলির চিৎকার কানে এল। তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখি একজন মহারাজ লাঠি দিয়ে ওকে মারছেন। আমাকে দেখে একটু লজ্জা পেলেন, বললেন, 'মারব না? প্রেয়ার হলে ছেলেরা আছে, ওখানে ঢুকেছে।' জানো, মারটা আমারই গায়ে যেন লেগেছিল।

''একবার হয়েছে কী, এইচ জি ওয়েলস-এর ইতিহাস বইটা সবে বেরিয়েছে। লাইব্রেরি থেকে নতুন বই এনে পড়ছি। খুব দামি বই। এদিকে জলির তখন দাঁত শক্ত হওয়ার সময়। ওই সময় ওদের হাড়-টাড় দিতে হয়; তা হাড় কোথায় পাব! জলি করেছে কী, এক ফাঁকে সেই বই খুব করে চিবিয়েছে। আর একটা কারণও বোধহয় ছিল। আমি যে ওই বইটার মধ্যে ডুবে আছি এটাও ওর পছন্দ হয়নি। তা যাই হোক, বইয়ের ওই অবস্থা দেখে আমি তো স্তম্ভিত! অত দামি বই, এখন কী হবে! রেগে জলিকে তাড়া করেছি। ও তক্তপোশের তলায় লুকিয়েছে। আমি ছাতা দিয়ে ওকে খোঁচাচ্ছি। একটু মেরেওছি। পরে নিজের ওপর খুব রাগ হল। ঘরে ঢুকে ওকে ডাকছি, আদর করছি। ও সাড়া দিল না। পুরো দিন-রাত না খেয়ে অসাড়ে শুয়ে রইল। পরদিন ওকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগলাম, আমি তখন কাঁদছি। বললাম, 'জলি, তোমাকে মেরে আমি কত কষ্ট পাচ্ছি তুমি বুঝছ না!' ও আবার তখন কুঁই কুঁই করে আমার গাল চেটে আদর করছে। ওখানকার একজন কর্মী খুব ভাল করে বইটা সারাই করে দিল। কিন্তু দিলে কী হবে, ওঁরা বুঝতে পেরেছেন। আমার বদনাম।

''খেলাধুলো খুব ভালবাসি। তা একবার একটা ফুটবল ম্যাচ দেখতে সাধুরা যাচ্ছি কয়েকজন। জলিও আমার পিছন পিছন আসছে। ঢিল তুলে ভয় দেখাচ্ছি, ভয় পাচ্ছে না। শেষে সত্যিই একটি ঢিল ছুঁড়লাম বাধ্য হয়ে। ও করল কী, ঢিল ছুঁড়লে যতদূর যায় সেই আওতার বাইরে থেকে আসতে লাগল। শেষে ওকে কোলে নিয়ে ম্যাচ দেখতে গেলাম। সবাই হাসছে। সাধুর কোলে কুকুর!

''খুব বুদ্ধি! বিদ্যাপীঠে পরীক্ষা হয়ে গেলে পিকনিক হত। তা একবার পিকনিকের দিন সকালে আমরা কয়েকজন আর ছাত্ররা আগে চলে গেছি, সামনে পুকুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে কে সাঁতার জানো হাত তোলো।' কয়েকজন হাত তুলল। তারা জলে নামল। আমি পাড়ে দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ পর দেখি একটা ছেলে জলে হাঁকপাক করছে, ডুবে যাবে। সাঁতার জানত না মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়েছি জলে। শীতকাল। খেয়াল নেই মাথায় টুপি, গায়ে সোয়েটার। জলে সেসব এত ভারি হয়ে গেছে, এগোতে পারছি না।

ডানদিকে জলি (১৯৫৯)

শেষে অনেক কষ্টে চিৎ-সাঁতার দিয়ে ছেলেটিকে তুলে আনছি। ওদিকে আমার অবস্থা দেখে জলির কী চিৎকার! যে-জলকে ভয় পেত, আমাকে বাঁচাতে সেই জলেই লাফিয়ে পড়ে আমার মাথার ওপর বসছে। বারবার হাত দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছি। কোনওমতে পাড়ে উঠেছি। আর একটা ছেলেও দেখি ডুবে যাচ্ছে, তার চুল দেখা যাচ্ছে। তাকেও তুললাম। এদিকে তখন গম্ভীরানন্দজী এবং অন্যান্য সাধুরাও এসে গেছেন। তাঁরা বলছেন, 'কী ব্যাপার?' সব বললাম। আর জলি করছে কী, পুকুরপাড় থেকে পিকনিকের জায়গা পর্যন্ত ছুটে যাচ্ছে আর আসছে। মানে আমাকে বাঁচিয়েছে সেটাই জানাচ্ছে। একটি ছাত্র ওকে খুব ভালবাসত। চলে আসার সময় তার কাছেই ওকে দিয়ে আসি। ওই ছেলেটির কাছে জলির উদ্দেশে অনেক চিঠি দিয়েছি। ছেলেটি চিঠি জলিকে শুনিয়ে আমায় উত্তর দিত। আমার বিশ্বাস জলি আমার চিঠি বুঝতে পারত।"

ভুলুর সঙ্গে মহারাজ

নরেন্দ্রপুরে থাকার সময় 'স্যাফায়ার' নামে একটি কুকুরকে খুব ভালবাসতেন মহারাজ। কর্মসূত্রে তাকে ছেড়ে গোলপার্কে চলে আসতে হয়েছিল। স্যাফায়ারও মহারাজকে হারিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই মহারাজ যখন মাঝে মধ্যে নরেন্দ্রপুরে যেতেন, তখন আর সে কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চাইত না। অনেক কৌশলে, একরকম তাকে ঠকিয়েই গোলপার্কে ফিরতে হত তাঁকে। মহারাজের নিজের কথায় : ''মিটিং শেষ হওয়ার পর যখন গোলপার্কে ফিরে আসব তখন আর স্যাফায়ারকে খুঁজে পাওয়া যেত না। যাবে কী করে? সে তো আমার আগেই গাড়িতে উঠে বসে আছে। একদিন সে কিছুতেই গাড়ি থেকে নামবে না।... তখন একটা বুদ্ধি বার করলাম। আর একটা দেশি কুকুর ছিল ভুলু, সেই ভুলুকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। আমাকে নিয়ে ওদের দুজনের মধ্যে ঈর্ষা ছিল। স্যাফায়ার অনেকক্ষণ লক্ষ করল আমি গাড়িতে উঠছি না, ভুলুর সঙ্গে হাঁটছি।... আর থাকতে পারল না। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এসে আমার সঙ্গে হাঁটতে শুরু করল। হাঁটতে হাঁটতে কুকুরের যেমন অভ্যাস এখানে সেখানে বাথরুম করে, তো একবার তাই করছে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে, আমি সেই সুযোগে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়লাম। গাড়ি ছেড়ে দিল। হঠাৎ গাড়ির আওয়াজ পেয়ে তাকিয়ে দেখে আমি চলে যাচ্ছি। একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তখন তার চোখে কী তীব্র ভর্ৎসনা—'এমনভাবে আমায় বঞ্চিত করলে? ঠকালে?' অন্যদিন গাড়ির পেছন পেছন ছুটে রাস্তা অব্দি পৌঁছে দিয়ে যায়। সেদিন একটুও নড়ল না। ওদের জন্য বড় কষ্ট হয়। মনে হয় ওরা আমায় তিরস্কার করে বলছে—ও, তুমি আমাদের সাথে betray করে চলে গেলে?"

যাঁদের তত্ত্বাবধানে রেখে এসেছিলেন স্যাফায়ারকে, সম্ভবত তাঁদের একটু অবহেলাও ছিল। মহারাজের মনে সেজন্য একটা ক্ষত ছিল। বৃদ্ধবয়সেও মহারাজ তার কষ্টে ভিতরে ভিতরে রক্তাক্ত হতেন। একদিন স্যাফায়ারের কথা বলতে বলতে হঠাৎ হাতদুটি জোড় করে বলতে লাগলেন, ''স্যাফায়ার, আমায় ক্ষমা করো। আমি তোমার প্রতি কত অবিচার করেছি।'' মহারাজের দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বিশ্ববরেণ্য বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর অশ্রুসিক্ত ব্যথাতুর সেই মুখখানি আজও ভুলতে পারি না।

স্যাফায়ার-এর সঙ্গে (১৯৭২)

প্রাচীন আর্য ঋষিদের কথা মনে পড়ে যায়। তাঁদের মতো যিনি একত্বে প্রতিষ্ঠিত, যাঁর অন্তরে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, ভেদাভেদ জ্ঞান নেই, আছে শুধুই প্রেম, তাঁর আকর্ষণও দুর্নিবার। তাই তাঁর কাছে মানুষ থেকে আরম্ভ করে বনের পশুপাখি এমনকী অশরীরীরাও যে ছুটে ছুটে আসবে, তাতে আর বিস্ময়ের কী আছে?

হ্যাঁ, অশরীরীদের প্রতিও তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজকে বলেছিলাম যে অশরীরীদের আমি ভয় পাই। আমার কথায় নিমেষে বেদনার্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর সদাহাস্যময় মুখখানি! একটু উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, ''ভয় পাবে কেন? 'ভূত' মানে অতীত। এই যেমন জামা পরে আছি, জামাটা ছেড়ে দিলাম। তিনটে শরীর আমাদের—স্থূল, সূক্ষ্ম আর কারণ। সূক্ষ্ম দেহটা অশরীরী অবস্থায় দেখা যায়। এতে ভয়ের কিছু নেই।'' তারপর ওঁর অফিসঘরের কাচের জানালা দিয়ে পথচারীদের দেখিয়ে বলেছিলেন, ''এই যে এত মানুষ হেঁটে যাচ্ছে, তুমি কি এদের ভয় পাচ্ছ? যাদের তুমি ভূত বলছ, তাদের শুধু স্থূল শরীরটাই নেই, এই তো? তাহলে তো আমার দেহ যাওয়ার পর আমাকে দেখলেও তুমি ভয় পাবে! শোনো, কখনও ওদের ভয় পেয়ো না। দেখলে ভালবেসে বলবে, 'তোমার কী কষ্ট বলো।' ওদের জন্য প্রার্থনা করবে। বলবে, 'তোমার মঙ্গল হোক, তোমার মুক্তি হোক—এই প্রার্থনা করি'।''

একদিন ওঁর অফিসঘরে প্রণাম করতে গেছি। দেখি মুখখানি ম্লান। কী হয়েছে জানতে চাইলাম। বললেন, ''কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি। একটি ছোট মেয়ে আমার কাছে মাঝে মাঝে আসত। সে এখানকার লাইব্রেরির মেম্বার। কাল রাতে বারবার তাকে দেখলাম, জানো! বুঝলাম সে আর নেই। কতবার তাকে কাছে ডাকলাম, তা এল না।''

এই ঘটনার দিন তিনেক পরে ইনস্টিটিউটে গিয়ে শুনি মহারাজ বেরিয়েছেন, এখনই ফিরবেন। কিছুক্ষণ পর মহারাজ ফিরলেন। ওঁর মুখেই শুনলাম, ওই মেয়েটির বাড়ি থেকে ওর এক আত্মীয়া (সম্ভবত দিদি) এসে মহারাজকে জানিয়েছেন, ''ও আত্মহত্যা করেছে। মা বলল ও আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করত। আপনি ওর পারলৌকিক কাজে যদি একটু গিয়ে দাঁড়ান।'' মহারাজ সেখানেই গিয়েছেন। মহারাজের গণ্ডিভাঙা ভালবাসা প্রত্যক্ষ করে সেদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম!

ক্রমশ